দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল শেষ কোথায়

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের দীর্ঘদিন থেকে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আগে চরমপন্থি সন্ত্রাসীরাই বেশি খুন হতো, এখন সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ অথবা রাজনীতিবিদ কেউ বাদ পড়ছে না। সরকার চরমপন্থীদের ধরতে একের পর এক অপারেশন চালাচ্ছে। কিন্তু এসব আইওয়াশ ছাড়া আর কিছুই না...

লিখেছেন যশোর থেকে **মামুন রহমান**

ঘটনা-১ : রেজাউল ইসলাম যশোরের একজন প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার। সেই সুবাদে অর্থকড়িরও মালিক। মাসখানেক আগে তার মোবাইলে একটি ফোন আসে। ফোন রিসিভ করতেই কণ্ঠস্বর ভেসে আসে 'তপন দাদা' বলছি। লাখ টাকা চাঁদা চাই তার। কিন্তু রেজাউল ইসলাম বললেন, 'সম্ভব নয়।' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন কথিত দাদা তপন। বললেন, এর পরিণাম ভালো হবে না। বারবার আমাদের প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম এবার বুঝিয়ে দেয়া হবে।

ঘটনা-২ : দেশের চরমপন্থী কবলিত এলাকা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হঠাৎ করেই ব্যাপক অশান্ত হয়ে পড়ছে। প্রায় প্রতিদিন খুন, গুম, ধর্ষণের মতো নারকীর ঘটনা ঘটছে। এ থেকে বাদ যাচ্ছে না পুলিশ কর্মকর্তারাও। তাদেরও শত শত মানুষের সামনে গুলি করে লাশ টেনে-হিঁচড়ে বুক চিরে নদীতে ফেলে দেয়া হচ্ছে। অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করায় ১৯ জুলাই থেকে এ অঞ্চলে আরেক দফা শুরু হয় যৌথ অভিযান। যার নাম দেয়া হয় স্পাইডার ওয়েভ। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তৎপর চরমপন্থীদের গ্রেপ্তার ও তাদের ঘাঁটি তছনছ করে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে দুর্বার গতিতে অ্যাকশন শুরু করে যৌথ বাহিনী।

ঘটনা-৩ : ৩০ জুলাই সকাল ৯টা। যশোর শহরের অন্যতম জনবহুল এলাকা বাবলাতলা ব্রিজ। পাশেই পুলিশ ফাঁড়ি। ঠিকাদার রেজাউল ইসলাম মোটরসাইকেলযোগে প্রয়োজনীয় কাজে যাচ্ছেন। হঠাৎ করেই গর্জে উঠলো স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। রাজপথে লুটিয়ে পড়লেন সুঠাম দেহের

অধিকারী তরুণ ঠিকাদার রেজাউল ইসলাম। রক্তে ভেসে গেল পিচঢালা পথ। সেই সঙ্গে প্রাণ পাখিটিও উড়ে গেল তার। দাদা তপনের সঙ্গে বেয়াদবি করার চরম পরিণতি ভোগ করতে হলো তাকে!

কে এই দাদা তপন? দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ তপন বলতে একজনকেই চেনেন। তিনি হলেন আব্দুর রশিদ তপন। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক কথিত সামরিক কমান্ডার। যিনি কিছুদিন আগে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে দল থেকে বেরিয়ে নিজেই গঠন করেছেন নতুন দল পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (জনযুদ্ধ)। ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, ঠিকাদারি কাজ দখলকে কেন্দ্র করে রেজাউল ইসলাম পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। এ নিয়ে তিনি কিছুটা শঙ্কিতও ছিলেন। এ অবস্থায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু হওয়ায় যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে বাঁচতে পারেননি রেজাউল। যৌথ অভিযানের মধ্যেই লাশ পড়ে যায় তার।

চাঁদাবাজি, যৌথ অভিযান এবং তার মধ্যেই লাশ ফেলে দেয়ার ঘটনা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এটিই প্রথম নয়। দেশ স্বাধীনের পর গত ৩২ বছর ধরে নারকীয় এ ঘটনাটি অহরহ ঘটছে রক্তাক্ত ও সন্ত্রাসকবলিত এ জনপদটিতে। কত মানুষ যে এ সময় এ অঞ্চলে চরমপন্থী, দুর্বৃত্তদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে, তার কোনো লেখাজোখা নেই। সরকার বারবার এদের দমন করার জন্য বিভিন্ন নামে অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শুধু লাশের সংখ্যা বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে স্বজনহারাদের হা-হুতাশ-আর সাধারণ মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। বাতাসে লাশ আর বারুদের গন্ধ এবং পাড়ায় পাড়ায় কান্নার রোল।

যেভাবে শুরু রক্তাক্ত অধ্যায়

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যে রক্তাক্ত অবস্থা বিরাজ করছে তার নেপথ্যে রয়েছে নষ্ট রাজনীতি আর অস্ত্রনির্ভর নিষিদ্ধ ঘোষিত

কোন এক হতভাগ্যের কঙ্কাল। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ডোবা-নালায় এমন কঙ্কাল পাওয়া যায়

তপন গোটা দক্ষিণাঞ্চলের ৩ কোটি মানুষের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক

চরমপন্থী দলগুলোর অপতৎপরতা। মূলত: প্রধান এ দুটি কারণেই এ অঞ্চলের ১ কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের জানমালের কোনো নিরাপত্তা নেই। সকালে ঘর থেকে বের হয়ে আবার যে সহি-সালামতে স্বজনদের কাছে ফিরতে পারবেন এমন কোনো গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। তার আগেই ওঁৎপেতে থাকা শত্রুর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে পারে বুক। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে রক্তাক্ত এ জনপদে।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, দক্ষিণাঞ্চলে এখন যে রক্ত ঝরছে তার কলঙ্কিত অধ্যায়টি শুরু হয়েছিলো দেশ স্বাধীনের আগে ১৯৭০ সালে। রক্সালপন্থী রাজনীতির মধ্যদিয়ে এর প্রসার ঘটানো হয়। এদেশের পিকিঙপন্থীরা গণ সংগঠন ত্যাগ করে গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের সিপিআই (এম) নেতা চারুমজুমদারের 'শ্রেণী শত্রু' খতমের লাইন ১৯৭০ সালের মে মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি বা ইপিসিপি (এম-এল) চারু মজুমদারের শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন গ্রহণ করে। অপরদিকে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে ১৯৬৮ সালে দেবেন, বাসার, মতিন ও আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে ইপিসিপি থেকে বেরিয়ে যাওয়া নেতাদের নিয়ে গঠিত পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টিও ১৯৭০ সালে চারু মজুমদারের লাইন গ্রহণ করে। এ দলটিই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রথম রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা করে এবং তা যশোর থেকেই। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭০ সালের ৩১ আগস্ট যশোরের বাঘারপাড়ায় প্রথম শ্রেণীশত্রু খতম অভিযান চালায়। তবে ঐ অভিযানটি সফল হয়নি। কথিত সেই শ্রেণীশত্রুটি প্রাণে বেঁচে যায়। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন গ্রহণ করে গঠন করে পৃথক গেরিলা স্কোয়াড, (আগস্ট-১৯৭০)। এরপর ঐ বছরের ১৬ অক্টোবর তাদের গেরিলারা প্রথম অভিযান চালায় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানার স্থানীয় চেয়ারম্যান এবং মুসলিম লীগ নেতা চাঁদ আলীর ওপর। যতদূর জানা যায়, তিনি এ অঞ্চলে প্রথম চরমপন্থীদের হাতে প্রাণ হারান। রক্ত ঝরার শুরুও হয় সেখান থেকে।

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি বা ইপিসিপি ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে তাদের পার্টির নাম পরিবর্তন করে রাখে বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)। ১৯৮৬ সালে দলটি শ্রেণীশত্রু খতমের লাইনও বাতিল করে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

কিছু বলতে চাই না

ডিআইজি, খুলনা রেঞ্জ

খুলনা বিভাগে রক্ত ঝরছে ৩২ বছর ধরে। এ সময়ের মধ্যে অন্তত ৩৬ বার বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে চরমপন্থী দুর্বৃত্তদের দমন করার জন্য। কিন্তু তাতে কিছুই হয়নি। খুনোখুনি অব্যাহত রয়েছে সমানগতিতে। কিন্তু কেন? সাধারণ মানুষ বলেন, এর জন্য পুলিশই বেশি দায়ী। তারা চরমপন্থী-দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারে যথাযথ ভূমিকা পালন করে না। এমনকি চরমপন্থীদের সঙ্গে গোপন আঁতাত রাখে তারা। যে কারণে তাদের ধরা যায় না। অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। আসলেই কি বিষয়টি সত্যি? এ বিষয়ে কি ভাবছেন খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি? আর কি করলেই বা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রক্তঝরা বন্ধ হবে? এসব বিষয়ে জানার জন্য কথা হয় খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি আব্দুল আজিজ সরকারের সঙ্গে। কিন্তু সবকিছু শুনেও তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি। বলেন, সরি আমার পক্ষে সাক্ষাৎকার দেয়া সম্ভব নয়।

এই দুটি দল ছাড়াও আর যে সমস্ত চরমপন্থী দল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে রক্তাক্ত জনপদে পরিণত করে তাদের মধ্যে রয়েছে সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি ও জাসদের গণবাহিনী। পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ৩ জুন বরিশালে। অন্যদিকে যশোরাঞ্চলে গণবাহিনী গঠিত হয় ঝিনাইদহে ১৯৭৩ সালে। এ দুটি দল গোপন সশস্ত্র রাজনীতিতে যুক্ত করে এক ভিন্ন মাত্রা। বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যে দলগুলো তৎপর রয়েছে তা এ দলগুলোরই উত্তরসূরি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এ অঞ্চলে বর্তমানে ১২টি চরমপন্থী দল রয়েছে। দলগুলো হলে- পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মোফাখখার চৌধুরী), পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (জনযুদ্ধ), বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (বরুন), গণমুক্তি ফৌজ, বাংলাদেশের সর্বহারা পার্টি (খালেক), সর্বহারা পার্টি (জোহা), পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (আনোয়ারুল-কবীর), জেহাদি পার্টি, ছিন্নমূল কমিউনিস্ট পার্টি ও গণবাহিনী। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথিত লড়াইয়ের মতো নীতি আদর্শহীন এ সংগঠনগুলো এখন বাস্তবে লুটেরা বাহিনী। আর সে কারণেই অহরহ ভাঙন ধরছে দলগুলোতে। গঠিত হচ্ছে নতুন নতুন দল। সেই সঙ্গে বাড়ছে খুন খারাবিও। দলের ওপর নেতাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকা এবং সেই সঙ্গে তাদের দমনে প্রশাসনের সীমাহীন ব্যর্থতায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রক্তঝরা বন্ধ হচ্ছে না। বরং নতুন নতুন দলগুলো এমন সব নারকীয় ঘটনা ঘটাচ্ছে যাতে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কখনো কমছে না। নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (জনযুদ্ধ) এ অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক নতুন আতঙ্ক যোগ করেছে। যশোরের কেশবপুর, মনিরামপুর, অভয়নগর আর খুলনার ফুলতলা ও ডুমুরিয়ার একটি অংশে মৃণাল বাহিনীর ভয়ে সাধারণ মানুষ থাকেন সব সময় তটস্থ। আর সদ্য গঠিত পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (জনযুদ্ধ) গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেই ত্রাসের রাম রাজত্ব কায়েম করেছে।

লাশ আর লাশ

দক্ষিণাঞ্চলে নকশালপন্থী রাজনীতির অর্থাৎ শ্রেণীশত্রু খতমের কথিত রাজনীতির ৩৪ বছর পার হয়ে গেছে। এ সময় এ অঞ্চলে কত মানুষ খুন হয়েছে, কত রক্ত ঝরেছে, কত মা সন্তান আর স্ত্রী স্বামী হারা হয়েছে তার কোনো তালিকা কোথাও নেই। তবে এক সময়ের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষনেতা, যিনি পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন এবং গঠন করেন শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলন নামে একটি প্রকাশ্য সংগঠন। সেই মীর ইলিয়াস হোসেন ওরফে দিলীপ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থীদের আত্মসমর্পণের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকালে সাপ্তাহিক ২০০০কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন (সংখ্যা-১৩ বর্ষ-২, পৃষ্ঠা-৩৩), চরমপন্থীদের হাতে এ অঞ্চলে অন্তত ৫ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। সে সময়ও পার হয়ে গেছে ৩ বছর। এ অঞ্চলে গড়ে এখন বছরে কমপক্ষে ৪০০ মানুষ দুর্বৃত্তের হাতে প্রাণ হারাচ্ছে। সেই হিসাবে গত ৩ বছরে আরো অন্তত ১২০০ আদম সন্তান খুন হয়েছে। সেই হিসাবে গত ৩৪ বছরে এ অঞ্চলে কমপক্ষে ৬ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। তবে এর সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে এ সময়ে এমন কিছু বর্বর, বীভৎস্য ও নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটে যা কখনো মানুষ ভুলতে পারে না। বার বার স্মৃতির মণিকোঠায় সেই ছবি ভেসে ওঠে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলে শ্রেণী শত্রুর তালিকায় প্রথম খতম হয়েছিলেন ঝিনাইদহ

রাজনীতিকরা যা ভাবছেন

‘এখন এ অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটতে পারে’

খালেদুর রহমান টিটো

‘আগে সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তরা খুন হতো, এখন রানীতিকরাও বাদ যাচ্ছে না’

নয়ন চৌধুরী
সভাপতি, যশোর জেলা বিএনপি

‘কর্মহীন যুব সমাজ সহজেই বিপথগামী হচ্ছে’

মাহবুব আলম
সাধারণ সম্পাদক
যশোর জেলা জাপা

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাস জিইয়ে রেখেছে কারা- সাধারণ মানুষের কাছে যদি এ প্রশ্ন করা হয় তাহলে সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন- রাজনীতিবিদরাই। এ পর্যন্ত এ অঞ্চলে যে সমস্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী চরমপন্থী ধরা পড়েছে তাদের প্রায় সবাই বলছে তারা নষ্ট রাজনীতির শিকার। রাজনীতিকরাই তাদের প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ব্যবহার করে বিপথগামী করেছে। সেই রাজনীতিবিদরা কি ভাবছেন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে? এ ব্যাপারে সবাই যে কথাটি বলেছেন, তাহলো দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু তা হচ্ছে না কেন? তার উত্তরও তারাই দিয়েছেন। বলেছেন, রাজনীতিকরাই সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করে। আর সে কারণেই এ অঞ্চল থেকে সন্ত্রাস উচ্ছেদ হয় না। যশোরের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির মহাসচিব খালেদুর রহমান টিটো ২০০০কে বলেন, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রক্তঝরা বন্ধ করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিতকরণ। কিন্তু কোনো দলই তা করতে পারছে না। বরং সরকার গ্যাট চুক্তির কারণে এ অঞ্চলে মিল, কলকারখানা আরো বন্ধ করে দিচ্ছে। আমি তো আশঙ্কা করছি এখন এ অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটতে পারে। কারণ কর্মহীন যুবসমাজ অর্থের পেছনে ছুটবে। চরমপন্থী দলগুলো এ সুযোগ লুফে নিতে পারে। তারা সহজে অগাধ অর্থ, প্রতিপত্তি আর অস্ত্রের মালিক হওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের দলে ভিড়িয়ে নেবে। সহজে অর্থ-বিত্তের মালিক হওয়ার লোভে যদি বেকার যুবসমাজ তাদের দলে ভিড়ে যায় তাহলে এ অঞ্চলে অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে।

যশোর জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ও সাবেক পিপি ফারাজী শাহাদাৎ হোসেন ২০০০কে বলেন, যে দেশের মানুষ একেবারে খালি হাতে পাক হানাদার বাহিনীর সব জুলুম-নির্যাতনকে পদদলিত করে দেশকে স্বাধীন করতে পারে সে দেশের মানুষ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারবেন না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আসলে এর জন্য প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা। বর্তমান সরকার চরমপন্থীদের দমনের নামে জনগণের আইওয়াশ করছে। গোপনে তারাই আবার চরমপন্থীদের লালন-পালন করছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের আমলে দেশ সন্ত্রাসমুক্ত হতে পারে না। কারণ তারা বিচারের আগেই ৫৩ হাজার সন্ত্রাসীকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। এভাবে শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল কেন দেশের কোথাও সন্ত্রাস মুক্ত করা যাবে না। আমি মনে করি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট।

'তারা যদি চায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত করা হবে তাহলে আমি মনে করি এক মাসেই ৬০ ভাগ সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে'

অ্যাড: এনামুল হক
সমন্বয়ক
সন্ত্রাস বিরোধী রাজনৈতিক মোর্চা

'তারা বিচারের আগেই ৫৩ হাজার সন্ত্রাসীকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে'

ফরাজী শাহাদাৎ হোসেন
আহ্বায়ক
যশোর জেলা আওয়ামী লীগ

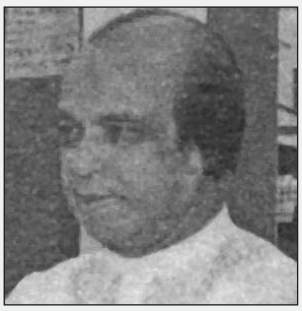

যশোর জেলা বিএনপি'র সভাপতি চৌধুরী শহিদুল ইসলাম ওরফে নয়ন চৌধুরী বলেন, 'আর অবহেলা ও রেষারেষি নয়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। আগে সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তরা খুন হতো, এখন রানীতিকরাও বাদ যাচ্ছে না। এটা কোনো দলের সাফল্য ব্যর্থতার বিষয় নয়, বিষয়টি হচ্ছে সব শ্রেণীর মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এর জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর ইস্পাত দৃঢ় অঙ্গীকারই কেবল পারে এ অঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে।

যশোর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও পিপি কাজী মুনিরুল হুদা বলেন, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে যা প্রথম প্রয়োজন তাহলো সব মহলের আন্তরিকতা। আমি মনে করি শুধু সরকার আর বিরোধী দল নয়- সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তাহলে অবশ্যই তাদের দমন করা সম্ভব। কারণ সন্ত্রাসীরা হাতে গোনা এবং তারা গডফাদার দ্বারা লালিত-পালিত হয়ে থাকে। সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন আর তারা দাপট চালাতে পারবে না। হয় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে হবে না হলে গ্রেপ্তার হতে হবে।

যশোর জেলা জাতীয় পার্টি ও আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আমল বাচ্চু ২০০০কে বলেন, সবার আগে মানুষের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা দিতে হবে। কিন্তু বর্তমান সরকার তা পারবে না। তারা আরো মানুষকে কর্মহীন করে দিচ্ছে। বন্ধ করে দিচ্ছে মিল, কলকারখানা। কর্মহীন যুব সমাজ সহজেই বিপথগামী হচ্ছে। এ ছাড়াও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সন্ত্রাসমুক্ত না হওয়ার অন্যতম আরেকটি কারণ হচ্ছে এ অঞ্চলের সন্ত্রাসীদের সাজা হয় না। এ দেশে এখন শুধু আলোচিত হত্যাকান্ডগুলোরই কেবল দ্রুত বিচার হচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শত শত বীভৎস্য হত্যাকান্ড ঘটলেও তার দ্রুত বিচার হয়নি। বিচার প্রলম্বিত হওয়ায় খুনিরা উৎসাহ পাচ্ছে। আবার স্বজনহারা মানুষ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ঘটাচ্ছে পাল্টা হত্যাকান্ড, যা থেকে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটছে। তাই সব হত্যাকান্ডেরই দ্রুত বিচার করতে হবে। যশোর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি শহিদুল ইসলাম মিলন বলেন, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যেসব নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটছে তার সবই আসলে চরমপন্থীরা ঘটাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে। কারণ এখন দেখা যাচ্ছে, কোনো নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটলেই তার দায়িত্ব কোনো না কোনো চরমপন্থী সংগঠন স্বীকার করছে। এক্ষেত্রে তারা যা করছে তাহলো পত্রিকা অফিসে ফ্যাক্স করে বলছে, আমরাই ওই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছি। কিন্তু কথা হলো এর সত্যতা কতটুকু? আমরা কি করে নিশ্চিত হবো সত্যি সত্যি চরমপন্থীরা হত্যাকান্ডটি ঘটিয়েছে? ফলে আগে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সন্ত্রাসের উৎসটি কি? তা সম্ভব হলেই এ অঞ্চলে রক্তঝরা বন্ধ করা সম্ভব হবে। কিন্তু আমাদের সে ধারার রাজনৈতিক কালচার গড়ে ওঠেনি। আর এ অবস্থার অবসান ঘটাতে না পারলে এ অঞ্চলে রক্তঝরা বন্ধ হবে না। যশোর শহর আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ও যশোর জেলা মৎস্যচাষী সমিতির প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ ফিরোজ খান বলেন, বারবার অভিযানের প্রয়োজন নেই। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে সরকারের সদিচ্ছা আর পুলিশের সততাই যথেষ্ট। কিন্তু তা হচ্ছে না বলেই এ অঞ্চলে রক্তঝরা বন্ধ হচ্ছে না।

'সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে যা প্রথম প্রয়োজন তাহলো সব মহলের আন্তরিকতা'

অ্যাডভোকেট কাজী মুনিরুল হুদা

জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার (বর্তমান) মুসলিম লীগ নেতা ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান চাঁদ আলী (১৬ অক্টোবর, ১৯৭০)। এরপর ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে ঘটে সবচেয়ে বড় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা। দুর্বৃত্তরা মাগুরার শালিখা থানার শতখালীর একটি যাত্রা প্যান্ডেল থেকে ১৮ জনকে নকশালপন্থী সন্দেহে অপহরণ করে তাদের ১২ জনকেই পার্শ্ববর্তী কাতুলী বিলে নিয়ে হত্যা করে। অপর ৬ জনেরও কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। ১৯৭৪ সালের মে মাসে দৌলতপুরে গণবাহিনীর ৮ জন ও খুলনার শরণখোলায় ৯ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকান্ডের জন্য রক্ষীবাহিনীকে দায়ী করা হয়। একই বছর অক্টোবরে খুন হয় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ঝিনাইদহের (কালীগঞ্জ) ওয়াজেদ ও মনা। এরপর এক সঙ্গে একাধিক হত্যাকান্ডের ঘটনা তেমন একটা ঘটেনি। তবে ১৯৮৯ সাল থেকে দৃশ্যপট আবার পাল্টে যায়। রক্তের স্রোত বইতে শুরু করে। ঐ বছর ঝিনাইদহের কংসীতে সর্বহারাদের হাতে গণবাহিনীর ৬ জন নিহত হয়। এভাবে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে নড়াইলের মেহতা গ্রামে ৮ জন, ২ মার্চ ঝিনাইদহের হরিণকুন্ড থানার রঘুনাথপুরে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির হাতে পূর্ব বাংলার ৭ জন, ১৯৯৪ সালে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার আড়পাড়ায় পূর্ব বাংলাদের হাতে নিরীহ গ্রামবাসী, ১৯৯৫ সালের ৬ জুলাই চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলবিলা গুচ্ছগ্রামে পূর্ববাংলাদের হাতে ওয়ার্কার্স পার্টির ৮ জন, ১৯৯৬ সালের ২৫ জুন ঝিনাইদহের শৈলকুপায় চর বরুলিয়ায় বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির হাতে

গণবাহিনীর ৬ জন, ২৭ জুন চুয়াডাঙ্গায় পূর্ববাংলাদের হাতে বিপ্লবীদের ৪ জন, ১৪ অক্টোবরে যশোর সদরের তালবাড়িয়ায় ৬ জন, ৩১ অক্টোবর সাতক্ষীরার তালা থানার হাজরাকাটিতে বিপ্লবীদের হাতে পূর্ববাংলার ৫ জন, ১৯৯৭ সালের ৩০ জুলাই নড়াইলে মির্জাপুরে বিপ্লবীদের হাতে পূর্ববাংলার ৫ জন, ১৯৯৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গার নীলমণিগঞ্জে পূর্ববাংলার ৭ জন ও ২৭ সেপ্টেম্বর পিরোজপুরে ৩ জন, ১৯৯৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি যশোরের সুলতানপুরে ২ জন, ৪ নবেম্বর ঝিনাইদহের হরিণকুন্ডে ২ জন, ২৮ নবেম্বর খুলনার তেরখাদার বাসুখালী বিলে ২ জন, ১২ ডিসেম্বর যশোরের ঘূর্ণিচাপ ডাঙ্গা এলাকায় এক সঙ্গে ১১ জন (এ অঞ্চলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হত্যাকান্ড), ১৫ ডিসেম্বর মেহেরপুরে ৫ জন, ১৯৯৯ সালের ৯ জানুয়ারি চুয়াডাঙ্গার শলুয়ার জয়রামপুর মাঠে ২ জন, ১৪ জানুয়ারি আলমডাঙ্গার বাগাদি গ্রামে ২ জন, ১৬ জানুয়ারি আলমডাঙ্গার বায়সায় ২ জন, একই ঘটনায় ১৭ ও ২৮ জানুয়ারি মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় ৩ জন, ৩১ জানুয়ারি খুলনার খেয়াঘাটে ২ জন, ১৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে জাসদ নেতা কাজী আরেফসহ ৫ জন, ৬ মার্চ রাতে যশোরে উদীচীর সম্মেলনে ১০ জন খুন হয়। এ ছাড়াও সম্প্রতি ঝিনাইদহ ও খুলনাতেও একসঙ্গে একাধিক নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। ঘাতকরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এমন বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে যা ভাবতেও গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। জীবন্ত মানুষ ধরে ইটভাটিতে নিক্ষেপ, অ্যাসিড দিয়ে পুরো শরীর ঝলসে দেয়া, এমনকি ৭/৮ খন্ড করেও কাউকে কাউকে হত্যা করা হয়। থানা পুলিশের কাছে তরতাজা কাটা মুন্ডু পাঠিয়ে দেবার মতো দুঃসাহসিক ঘটনারও নজির রয়েছে এই অঞ্চলে। একবার চরমপন্থীদের রোষানলে পড়লে সে আর রক্ষা পেয়েছে তেমন নজির নেই। যার বাস্তব প্রমাণ মনিরামপুরের ৪ চরমপন্থী। নিজেদের জীবনাশঙ্কার কথা থানা পুলিশকে জানিয়ে বাড়ি ফেরার পথেই ২০০২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারা প্রতিপক্ষের ব্রাশ ফায়ারে নিহত হয়। এমন অনেক নিদর্শন রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে।

খতমের তালিকায় জনপ্রতিনিধি

রক্তাক্ত জনপদ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শুধু সন্ত্রাসী-দুর্বৃত্ত আর সাধারণ মানুষ নয়, জনপ্রতিনিধিরাও নির্বিচারে হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, জাতীয় সংসদের সদস্য এবং শীর্ষ রাজনীতিবিদ পর্যন্ত রয়েছেন এ তালিকায়। এদের সংখ্যা কমপক্ষে ৫ শতাধিক। যার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানই রয়েছেন অন্তত ৫০ জন। এই সমস্ত হত্যাকান্ডগুলোর জন্য যেমন চরমপন্থীরা দায়ী, তেমনি নিহত ব্যক্তিদের কেউ কেউ কম দায়ী ছিলেন না। বলা যায়, গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গত ৩৪ বছর ধরে যে রক্ত ঝরছে

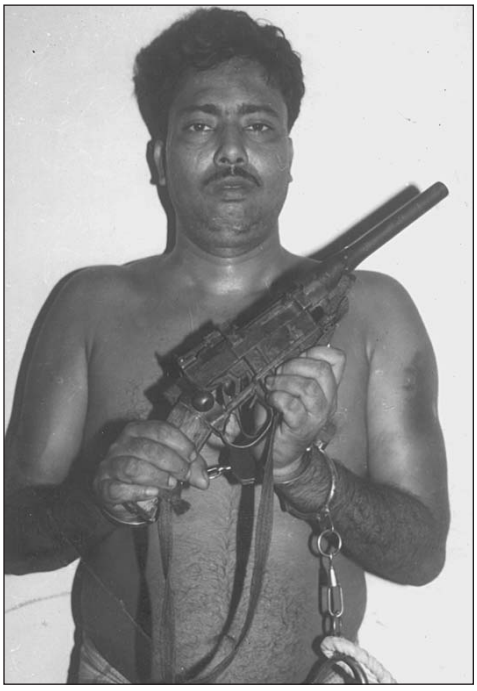

অস্ত্রসহ গ্রেফতার ভয়ঙ্কর অপরাধী অশোক

তার জন্য এ অঞ্চলের রাজনীতিক-জনপ্রতিনিধিরাও কম দায়ী নন। দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থে তারা চরমপন্থীদের ব্যবহার করেছে এবং করছে। কিন্তু সাপ যেমন ওঝাকেও ছাড়ে না, ঠিক তেমনি চরমপন্থীদের হাত থেকে তারাও রক্ষা পায়নি। এক সময়ের শেল্টারদাতা গডফাদারকে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছে তারই লালিত সন্ত্রাসীদের হাতে। আবার এর ব্যতিক্রম ঘটনাও ঘটেছে। অপেক্ষাকৃত সৎ ও জনপ্রিয় নেতাকে ভাড়াটে খুনি দিয়ে সরিয়ে দিয়ে পথের কাঁটা দূর করেছে তার প্রতিপক্ষ। আর এর ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত রয়েছে। যে কারণে অব্যাহত রয়েছে হত্যাকান্ডও।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, এ অঞ্চলে প্রথম শীর্ষ পর্যায়ের রাজনীতিক খুন হন ১৯৭২ সালের ৬ জুন। আওয়ামী লীগের গণপরিষদ সদস্য এমএ গফুরকে চরমপন্থীরা পাইকগাছায় হত্যা করে। এরপর ১৯৭৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর কুমারখালীতে নিহত হন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়া। গণবাহিনীর ক্যাডাররা তাকে ঈদের দিন গুলি করে হত্যা করে। ১৯৭২ সালের ২৮ ডিসেম্বর খুলনার দৌলতপুরে খুন হন আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক আবু সুফিয়ান, ১৯৯১ সালের ২৪ ডিসেম্বর চেয়ারম্যান প্রার্থী ইমরান গাজী, ১৯৯২ সালের ৩১ জুলাই প্রখ্যাত বাম রাজনীতিক রতন সেন, ২০০০ সালের ১১ আগস্ট খুলনার শীর্ষ আওয়ামী লীগ নেতা এসএমএ রব, ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়া-দৌলতপুর জাসদ নেতা কাজী আরেফ, ২০০১ সালের ৪ আগস্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ। সর্বশেষ খুন হয়েছেন খুলনায় আওয়ামী লীগ নেতা মঞ্জুরুল ইমাম। এই তালিকায় উল্লেখ করার মতো আরো এতো নাম আছে যে তা শুধু দীর্ঘায়িতই হবে।

সাংবাদিক নিধন

রক্তঝরা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সাংবাদিকরা কাজ করেন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে। তারা জানেন যেকোনো সময় তাদের লাশ পড়ে যেতে পারে। তবুও সিংহভাগ সাংবাদিকই এ ব্যাপারে থেকেছেন আপোসহীন। লিখেছেন শক্ত হাতে। এতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তাদের। দুর্বৃত্তদের তপ্ত বুলেটে থেমে গেছে তাদের কলম। শামছুর রহমান আর সাইফুল আলম মুকুলের মতো অকুতোভয় সাংবাদিকরাও রেহাই পাননি তা থেকে। ১৯৯৮ সালের ৩০ আগস্ট 'দৈনিক রানার' সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুল আর ২০০০ সালের ১৬ আগস্ট সন্ধ্যা রাতে জনকণ্ঠের যশোর অফিসে খুন হন শামছুর রহমান। এভাবে দুর্বৃত্তরা আরো যাদের প্রাণ সংহার করেছে তারা হলেন, সাতক্ষীরার পত্রদূত সম্পাদক স.ম সালাউদ্দিন (১৯ জুন '৯৬), চুয়াডাঙ্গার দিন বদলের সাংবাদিক বজলুল রহমান, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম, ঝিনাইদহের বীর দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক মীর ইলিয়াস হোসেন, দৈনিক অনির্বাণ পত্রিকার ডুমুরিয়া প্রতিনিধি নহর আলী ও দৈনিক পূর্বাঞ্চলের অপরাধ বিষয়ক প্রতিনিধি আব্দুর রশিদ। এ ছাড়াও অসংখ্য সাংবাদিক দুর্বৃত্তদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। অনেকটা মৃত্যু পরোয়ানা কাঁধে নিয়েই তাদের কাজ করতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মতো সাংবাদিকদেরও জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই।

পুলিশ নিধন

শুধু সাধারণ মানুষ, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক আর সমাজ প্রতিনিধি নয়, এখন তাদের জানমালের দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যরাও নির্বিচারে খুন হচ্ছেন। তাদেরকেও পশুপাখির মতো গুলি করে বোমা মেরে হত্যা করা হচ্ছে। গুলি করে বুক ঝাঁঝরা করে প্রকাশ্য দিবালোকে তা টেনে হেঁচড়ে নদীর পাড়ে নিয়ে বুক চিরে ফেলে দেয়া হচ্ছে নদীতে। আগে চরমপন্থীরা শুধু সাধারণ মানুষ হত্যা করলেও এখন তারা নতুন করে খতমের তালিকায় পুলিশ প্রশাসনকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম পুলিশের শ্রেণীশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। তাদের সাবেক বিভাগীয় সামরিক কমান্ডার শিমুলকে যশোরের পুলিশ গ্রেপ্তার করলে তারা এ ব্যাপারে লিফলেটও ছড়ায়। ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, মাত্র ৯ মাসে শুধু বৃহত্তর খুলনায় ১১ পুলিশ খুন হয়েছে। এদের সিংহভাগকেই গুলি ও বোমা

মেরে হত্যা করা হয়। পুলিশ হত্যাকান্ডের সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে গত ৩ জুলাই। এ দিন সকালে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডাররা খুলনার রূপসা উপজেলার শিয়ালী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শামছুল হক ও হাবিলদার আবু বকরকে বামনডাঙ্গা বাজারে গুলি করে হত্যা করে। এরপর লাশ নিয়ে বুক চিরে আঠারোবেকি নদীতে ফেলে দেয়। শুধু এই একটি ঘটনাই প্রমাণ করে দেয় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কি অবস্থা বিরাজ করছে।

রেহাই পাচ্ছে না দুর্বৃত্তরাও

যারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে নরকে পরিণত করেছে, তারাও কিন্তু রেহাই পাচ্ছে না। একের পর এক নারকীয় ঘটনার জন্ম দিয়ে যারা এ অঞ্চলের প্রায় ৩ কোটি মানুষের কাছে মূর্তিমান আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল তাদের একজনেরও স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। যাদের নাম শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠতো, বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি খেত, কোনো একদিন সকালে উঠে খবর পাওয়া যেত দোর্দন্ড প্রতাপশালী সেই দুর্বৃত্ত আর নেই। লাশ পড়ে আছে কোনো খাল-বিল, ডোবায় বা ঝোপঝাড়ের মাঝে। গুলি করে বুক ঝাঁঝরা অথবা টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হয়েছে তাকে। অতীতে যারা এ অঞ্চলে কাঁপিয়েছে তাদের পরিণতি দেখলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশ স্বাধীনের আগে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের মানুষ সিরাজ নামে এক ব্যক্তির ভয়ে থর থর করে কাঁপতো। 'সিরাজ ডাকাত' নাম শুনলে ভয়ে কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতো না। সেই সিরাজ ১৯৬৩ সালে প্রতিপক্ষের হাতে খুন হয়। এরপর দেশ স্বাধীনের পর গোটা চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের অঘোষিত মালিক বনে যায় ইটের ভাটিতে জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত নুরুজ্জামান লাল্টু ও তার বড় ভাই আরেক দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী মন্টু। এদের মধ্যে মন্টু খুন হয়েছে ৭৫ সালের ২১ মার্চ। আর লাল্টু রয়েছে কারাগারে। মজার ব্যাপার হলো, ডাকাত সিরাজ হলো মন্টু-লাল্টুর পিতা। এভাবেই অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে যশোরের এক সময়ের অপরাধ জগতের মুকুটহীন সম্রাট মোস্তাক হাসান, বেনাপোল সীমান্তের ত্রাস আকিম, মহির, কোরবান, নূর হোসেন, ইসলাম, যশোরের রশিদ বাহিনী প্রধান রশিদ, আঁখি, কোহিনূর, গোলাম নবী, কটা, খায়ের হামেদ, জলিল, জাকির গফুরদের। তবে এদের আধিপত্য ছিল অঞ্চলভিত্তিক। আসাদ, সন্ন্যাসী, লাল, কামরুল, টাইগার খোকন, শরিফুল ও দিলীপদের দাপট ছিল গোটা দক্ষিণাঞ্চলে। এদের নামে বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি খেতো। কিন্তু তারপরও তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। প্রত্যেকেই নৃশংসভাবে খুন হয়েছে প্রতিপক্ষের হাতে। অস্ত্রের বলে তারা ধরাকে সরা আর দক্ষিণাঞ্চলকে নরকে পরিণত করলেও নিজেদের জীবনকে শঙ্কামুক্ত করতে পারেনি। ভয়ঙ্কর দুর্বৃত্ত আসাদ এবং জলিল ৯ সঙ্গীসহ একসঙ্গে খুন হয় ১৯৯৮ সালের ১২ ডিসেম্বর যশোরের বাঘারপাড়া এলাকায়। ৯০-এর দশকে গোটা দক্ষিণাঞ্চলে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির শহিদুল ইসলাম লাল, সর্বহারা সন্ন্যাসী বিশ্বাস আর নিজাম উদ্দিন কামরুলের। কিন্তু তারাও অপঘাতে মৃত্যু এড়াতে পারেনি। '৯০ সালের ৯ আগস্ট কামরুল, '৯৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাল আর '৯৭ সালের ৪ নবেম্বর সন্ন্যাসী নিহত হয়। '৯৮ সালের ১৯ জুন প্রাণ হারায় ত্রাস শরিফুল। এমনকি অপরাধ জগৎকে চিরতরে বিদায় জানিয়েও বাঁচতে পারেননি এক সময়ের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা দিলীপ। ২০০০ সালের ১৬ জানুয়ারি সন্ধ্যা রাতে দুর্বৃত্তদের ব্রাশফায়ারে নিহত হন তিনি। অর্থাৎ যারা গোটা

বনদস্যু রফিক, সুন্দরবনের ত্রাস

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৩ কোটি মানুষের কাছে বিভীষিকাময় পরিবেশ তৈরি করেছে তারা নিজেরাও নিহত হয়ে সে মাত্রায় নতুন আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। মানুষ খুন করার পর তারাও যে খুন হবে- এ পরিণতি জেনেও কেউ 'চরমপন্থী' লাইন ত্যাগ করতে পারছে না। নতুনদের মধ্য থেকেই তৈরি হচ্ছে আরেক আসাদ, সন্ন্যাসী, লাল, শরিফুল সিরাজরা। আর এদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকছে তারা হয় আছে কারাগারে না হলে নিজ ডেরায় বন্দী। এদের একজনেরও স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে এমন নজির নেই।

তাহলে এর শেষ কোথায়?

যেভাবে চলছে এভাবে চললে এর কোনো শেষ নেই। পুলিশ, বিডিআর, রাজনীতিবিদ, সমাজ প্রতিনিধি আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে অন্তত তাই মনে হয়েছে। সবাই বলেছেন, এর জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ। যশোরে সন্ত্রাসবিরোধী একটি রাজনৈতিক মোর্চা রয়েছে। সব দল এবং সংগঠনের নেতাদের নিয়ে এই মোর্চা গঠিত। কিভাবে সন্ত্রাস বন্ধ করা যায়? এ প্রশ্নকে সামনে রেখে একটি কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। কনভেনশনে সন্ত্রাস দমন আর রক্তঝরা বন্ধ করতে মোট ১৬টি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তাহলো : (১) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের সংস্কার ও বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণ; (২) রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বকে সন্ত্রাসবিরোধী ও সন্ত্রাস নির্মূলে ভূমিকা পালন; (৩) সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেয়া ও অবস্থার পরিবর্তনে 'জমি বদলে' সহযোগিতা না করা; (৪) রাজনৈতিক দলে পেশিশক্তির বদলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকরণ; (৫) প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জবাবদিহিতা ও অপরাধ দমনে নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণ; (৭) অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও চোরাইপথে অস্ত্র আসা বন্ধকরণ; (৮) চোরাচালান, অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ; (৯) চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং অস্ত্রবাজদের গ্রেপ্তারে প্রশাসনকে সহায়তা ও বাধ্য করা; (১০) শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারদের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা; (১১) সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি ও দায়বদ্ধতার পরিচয় দেয়া; ('২) সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং তাতে পৃষ্ঠপোষকতা করা; (১৩) যুবসমাজকে সুষ্ঠু সংস্কৃতি ও খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা; (১৪) সন্ত্রাসী ও অপরাধী প্রত্যর্পণে আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তি সম্পাদন করা। (১৫) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় অঞ্চলভিত্তিক প্রতিরক্ষা দল ও কমিউনিটি পুলিশ গঠন এবং (১৬) পুলিশ প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করে আরো আধুনিকীকরণ।

সন্ত্রাসবিরোধী রাজনৈতিক মোর্চার সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট এনামুল হক ২০০০কে বলেন, মোটামুটি এই ১৬টি ক্ষেত্র যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সন্ত্রাস অনেক কমে যাবে। কালো টাকা আয়ের উৎস, প্রশাসনিক শেল্টার আর অস্ত্রের যোগান বন্ধ করতে পারলেও বড় ধরনের সুফল পাওয়া যাবে। তবে সবার আগে যা প্রয়োজন তাহলো সরকার ও বিরোধী দলের সদিচ্ছা। তারা যদি চায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত করা হবে তাহলে আমি মনে করি এক মাসেই ৬০ ভাগ সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে।